OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 133 - 143
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দেশভাগ ও বাঙালি উদ্বাস্তু নারীর জীবন

সুদীপ্তা রায়
প্রাক্তন ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID: sudiptaroy741121@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Partition, Religion, Chastity, Refugees, Inhuman, Poverty, Outside world, Education, Women's liberation.

Abstract
In order to fulfill the heinous plots and political interests of some people, India was partitioned on August 14 and 15, 1947, creating two separate states, Pakistan and India respectively. Due to lack of proper planning and haste, the ancestral habitats of many people were divided, coupled with a situation of religious riots. As a result, millions of people became homeless refugees. This refugee problem not only created a political crisis; it also dealt a terrible blow to the lives of millions of people. Starting from children to the elderly, no one was spared from this impact. However, innocent women were the most affected in the partition situation. In a state created on the basis of religion, women, who were weaker than others and their sensual bodies, became the main targets of attack for those who attacked people of different religions. To escape from these, the once peaceful women, who were once confined to the nest of peace, were forced to flee with their families as refugees. But there was no peace there either, many women were kidnapped and raped on the way, and even after reaching this country, they were forced to live a life of indignity as refugees. The continuous humiliation and violence as refugees gradually strengthened the refugee women from within, and they became vocal in their protest. The entry of refugee women into the outside world to earn a living for the sake of their stomachs caused a crack in the conservatism of society, and the spread of women's education for the sake of earning a living gradually spread awareness about women's freedom and gender inequality, which resulted in increased public awareness and the entire women's society began to awaken. The new century brought the message of women's freedom, which was initiated by the refugee women of that day.

Discussion

১৯৪৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট কিছু স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী মানুষের ঘৃণ্য চক্রান্তে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। এভাবেই এল ভারতবর্ষের বহু আকাঙ্ক্ষিত ও স্বপ্নের স্বাধীনতা। তবে শুধু দেশের অঙ্গব্যবচ্ছেদই হল না। সুপরিকল্পনার অভাবে ও দ্রুততার কারণে একই সাথে ভাগ হয়ে গেল বহু মানুষের বাস্তুভিটে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একই সাথে শুরু হয়ে গেল ইসলাম ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিতারণের অঘোষিত, অপ্রত্যক্ষ অথচ অতিস্পষ্ট কর্মসূচি। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়ে গেল বাস্তুহারা উদ্বাস্তু। এতদিন ব্রিটিশের অধীনে সকল ভারতবাসীই ছিল পরাধীন, তাদের পরিচয় ছিল একটাই 'পরাধীন ভারতবাসী'। এই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নির্বিশেষে তারা ব্রিটিশ বিরোধিতায় শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই রূপ বদলে গেল। ইসলামের জন্য নির্দিষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক সহাবস্থান হয়ে উঠল একপ্রকার অসম্ভব।

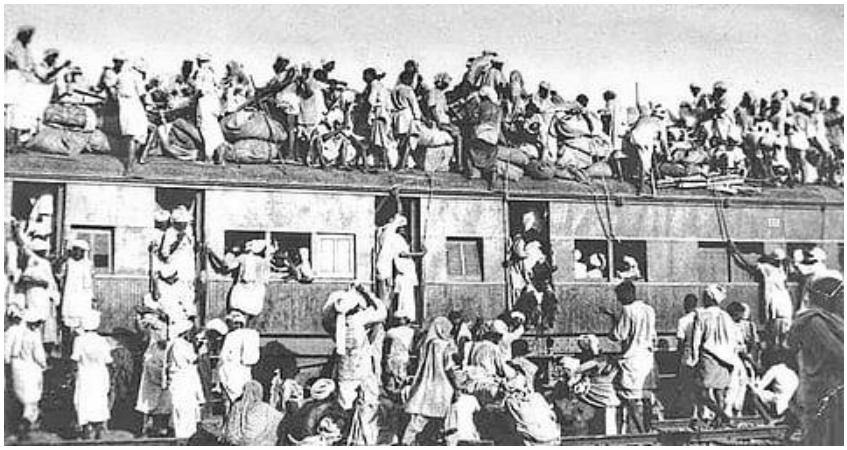

সূত্র: https://www.newindianexpress.com/nation/2017/Aug/17/walk-down-memory-lane-at-amritsars-partition-museum-1644465.html

স্বাধীনতার প্রাক্কালে এ ধরনের কিছু দাঙ্গা হয়েছিল বটে, তবে স্বাধীনতার পর ধাপে ধাপে হওয়া দাঙ্গা তথা নানারূপ নির্যাতন এক ভিন্নরূপ ধারণ করে। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের, ফলে এ দুটি রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তু আগমন ঘটেছিল। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরপরই উদ্বাস্তু আগমন ঘটে এবং সরকারি তৎপরতায়, জনবিনিময়ের মাধ্যমে এই সমস্যা নিরূপণ সম্ভব হয়। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি, এখানে উদ্বাস্তুরা এসেছে ধাপে ধাপে, প্রচুর পরিমাণে এবং অধিকাংশজন-ই কপর্দক শূন্য অবস্থায়। বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা নিরসনে ভারত সরকারের ভূমিকাও ছিল খানিকটা নেতিবাচক, ফলে পশ্চিমবাংলা তথা গোটা দেশের ওপর এই বাড়তি জনসংখ্যার বিপুল চাপ কুপ্রভাব ফেলে।[১] উল্লেখ্য যে প্রথমদিকে আতঙ্কে কিছু মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ পাকিস্তানে চলে গেলেও ভারত সরকারের আশ্বাস, সহযোগিতা ও সমর্থনে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতেই থেকে যান।

সূত্র: https://www.anandabazar.com/entertainment/koushik-sen-pens-a-tribute-to-the-veteran-director-ritwik-dgtl-1.83643

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেশভাগজনিত বিভীষিকার দুর্ভোগ শিশু থেকে বৃদ্ধ কমবেশি সকল মানুষকেই সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু নারীদের জন্য এই দুর্ভোগ ছিল সীমাহীন, নারীরা অন্য ধর্মের আক্রমণকারীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় নারীদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়, নারীদেরকে যেকোনো পরিবারের মর্যাদার সাথে একাত্ম করে দেখা হয়ে থাকে, নারীরা প্রকৃতিগতভাবে কোমল ও দুর্বল। সবকিছু ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এত মানুষের পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসার পেছনে যে সকল কারণগুলিকে দায়ী করা যায় তার মধ্যে অন্যতম ছিল প্রাণের মায়া এবং নারীর সম্মান রক্ষার চেষ্টা। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় ভারতের স্বাধীনতা লাভকালীন সময়ে মেয়েরা বিশেষত সাধারণ বাঙালি পরিবারের মেয়েরা ছিল একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যা, অতি অল্প বয়সে তাদের বিবাহ হত এবং পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির নির্দেশ ক্রমে পর্দাসীনভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত হত, অতি প্রয়োজনে কদাচিৎ তারা বাইরের জগতে পা রাখতেন। নিজ পিতৃ ও শ্বশুরকুলের কুলমর্যাদা এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলা নারীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। দেশভাগের ফলে যে বর্বরোচিত নৃশংস কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়, তা নারীর ঠিক এই জায়গাতেই আঘাত হানে। দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে নারীরা ঠিক কী রকম ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থটি থেকে এমন ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে যা তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনে পরবর্তীতে স্মৃতি থেকে উত্থাপন করে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনাটির বিবরণ এরকম - এক হিন্দু মহিলা পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু যুবক ও বৃদ্ধ মুসলমান পুকুরের দুপারে জড়ো হয়ে অশ্লীল ছড়া কাটতে শুরু করল। এপার থেকে আওয়াজ উঠল - 'পাক পাক পাকিস্তান'। অন্য পার থেকে উত্তর এল, 'হিন্দুর ভাতার মুসলমান'। ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি জলের মধ্যে অসার হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমান সিঁড়ি বেয়ে স্নানের ঘাটে নেমে এসে বলল, "বিবিজান, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! দেরি করছ কেন? বাড়ি যাবে না?" মেয়েটি তখনো জলের মধ্যে স্থির, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর দু-পাড়ে সমবেত মানুষের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে মধ্যবয়স্ক লোকটি বলল, -

> "আরে, তোদের চাচীর গাঁটগুলো শক্ত হয়ে গেছে রে। ওর নড়বার শক্তি নেই। তোরা ওকে হাত ধরে জল থেকে তুলে নিয়ে আয়।"[২]

সত্যিই কি ভয়ানক রকম মানসিক নির্যাতন। পূর্বপাকিস্তান থেকে কেন চলে আসতে হল সে সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের ৮ই অক্টোবর অমৃতবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত নোয়াখালী থেকে আগত একজন উদ্বাস্তু শশীভূষণ দত্তের বক্তব্য হল, - "সর্বদা আমাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। মুসলমানরা প্রায় আমাদের বাড়ি এসে শাসিয়ে যেত, কুমারী মেয়েদের মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। আমার তিনটি মেয়ে এরপর আমি পূর্ববঙ্গে কি করে থাকি?" এতো গেল নিছক মানসিক নির্যাতনের কথা, বাস্তব পরিস্থিতি ছিল অত্যধিক ভয়াবহ। এক সম্প্রদায়ের নারীর উপর অপর সম্প্রদায়ের শিউরে উঠা নৃশংসতায় ক্ষতবিক্ষত নারী শরীরগুলিকে যেন এই সময় পৈশাচিক বিজয়ের চিহ্নরূপে দেখা হতে থাকে। কেবলমাত্র অপহরণ ও ধর্ষণই নয় নারীদেরকে আরো নানাভাবে চূড়ান্ত অবমাননা ও নির্যাতন করা হত। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, -

> "Breast and noses are cut off, their bodies branded or tattooed with signs and symbols of 'other religion', pregnant were forcibly aborted and often women were made to strip naked and paraded through the street in town and cities."[৩]

এই ভয়াবহ পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে বহু হিন্দু পরিবার ভারতে চলে আসাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীও অনুরূপ অভিযোগ করে বলেন পূর্বপাকিস্তান থেকে ক্রমাগত তার কাছে যে চিঠি আসছিল তা থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন শুধু অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়নই নয় পাশাপাশি হিন্দু মহিলাদের নানা রকমের নির্যাতন এমনকি অপহরণও দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং বলাই যায় এই পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বসবাস করার বিষয়টি হয়ে গিয়েছিল এক প্রকার অসম্ভব।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সূত্র: https://www.sentinelassam.com/more-news/editorial/a-trainload-of-dead-bodies-partition-horrors.

কিছু উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মানুষ পূর্বানুমানের ভিত্তিতে দেশভাগের আগেই তাদের পরিবারের যুবতী নারীদের ভারতে কোনো আত্মীয় পরিজনের বাড়িতে বা বাড়ি ভাড়া করে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যাটা ছিল মুষ্টিমেয়। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আসার পথটাও নেহাৎ মসৃণ ছিল না। এই আসার পথেও বহু নারী তাদের পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। স্টিমার ঘাট, বিমান বন্দর, রেল স্টেশন, সীমান্ত সর্বত্র একতরফা ধর্ষণ, লুটপাট চলে।[৪] বহু নারীকে এই সময় পরিবারের কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, মাত্রাতিরিক্ত পাশবিক নির্যাতনের পর তাদের অধিকাংশের ভাগ্যে জোটে মৃত্যু কিংবা স্থান হয় পতিতালয়ে। আর এসব কারণে অনেক সময় নিজের পরিবারের লোক এই ধরনের কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে যুবতী নারীটিকে কিংবা তাদের কন্যাটিকে হত্যা করত, কারণ তাদের প্রথাগত মূল্যবোধ অনুযায়ী মান ছিল প্রাণের থেকেও দামি।[৫] এখানে উল্লেখ করে রাখা ভালো যে বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট নারীর অসহায় অবস্থার সুযোগ তার নিজ ধর্মের লোক এমনকি কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারীরাও গ্রহণ করতেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা দেবী তাঁর 'নারীর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই লিখেছেন, -

> "পূর্ববঙ্গীয় নারীগণকে তাদের জীবন, সতীত্ব, স্বামী ও সন্তানের জীবনের মাধ্যমে স্বাধীনতার মূল্য চোকাতে হয়েছিল। বিপুল পরিমাণে ধর্ষণ, অপহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ ছিল আক্রমণকারীদের প্রধানতম অস্ত্র। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি শুল্ক আধিকারিকগণও পশ্চিমবঙ্গের দিকে আসা মহিলাদের তল্লাশির নামে অসম্মানিত করত।"[৬]

যদিও কিছু ভালো মানুষের অস্তিত্ব এই সময়েও ছিল যারা মানবতাবোধ ও দায়িত্ববোধকে ধর্মের উপর স্থান দিয়েছিলেন। এই জন্যই বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা সুপ্রিয় সেনের মায়ের স্মৃতি থেকে উঠে আসে সেই সকল সুহৃদ মুসলমান প্রতিবেশীর কথা যারা দেশ ছেড়ে আসার সময় তাকে সাহায্য করেছিলেন, পাওয়া যায় একজন মুসলিম কাস্টম অফিসারের কথা যিনি বেনাপোল বর্ডার যাতে তারা নিরাপদে পার হতে পারেন সেজন্য সঙ্গে এসেছিলেন।[৭] যদিও এমন ভালো মানুষ ও সুখকর অভিজ্ঞতার সংখ্যা ছিল নিতান্তই সামান্য। আসলে এই সময় সীমান্ত পার হওয়া ছিল নারীর কাছে তার সতীত্ব রক্ষার পরীক্ষারই নামান্তর। এই কারণেই হয়তো ট্রেন বা উদ্বাস্তু মিছিল সীমান্ত পার হলে নারীরা মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হর্ষধ্বনী বা উলুধ্বনি দিত।[৮] যদিও তথাকথিত পবিত্রতা ও সম্মান রেখেই সীমান্ত পার হতে পারলেও এপারের মানুষেরা এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই নারীর নিজ পরিবারের লোকেরাও নারীটিকে অসম্মানের চোখে দেখতো,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কারণ তারা ধরেই নিত যে বিধর্মীরা সম্মানহানি করে তবেই তাদের ছেড়েছে।[৯] এ যেন ঠিক পৌরাণিক মহাকাব্য রামায়ণের সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার পরেও তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার শামিল।

এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পেতে ভারতে এসে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তথা নারীরা আর এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন। দেশভাগের পূর্ববর্তীকালে পরিবারের শান্ত গৃহকোণে পর্দাসীনভাবে অধিকাংশ নারীদের জীবন অতিবাহিত হত। কিন্তু উদ্বাস্তু হিসেবে দেশান্তরে এসে আশ্রয়াভাবে তাদের স্থান হয়েছে প্লাটফর্ম, ফুটপাত কিংবা লাইনের ধারে কোন গাছ তলায়। এখানে পাশাপাশি গাদাগাদি করে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে উদ্বাস্তু শিবিরে স্থান সংকুলান কিংবা অন্য কোন সমাধান লাভের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায়। এরকম অবস্থায় ঠিক কীরকম ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তা আরো স্পষ্ট করে তুলতে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাংবাদিক যা লিখেছেন সেটি তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন যে, - "...প্ল্যাটফর্মের কিছুটা জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বাস্তু শিবিরে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত এই জায়গাটাই তাদের ঘরবাড়ি। ভাবতে পারেন, কিভাবে এই স্বল্প পরিসর জায়গায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে গাদাগাদি করে দিন কাটাচ্ছে! এত মানুষের পানীয় জল সরবরাহের জন্য জলের কল মাত্র তিনটি; মহিলাদের জন্য পায়খানা মাত্র দুটি, পুরুষদের জন্য মাত্র বারোটি।

প্ল্যাটফর্মে থাকাকালীন উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছ থেকে রেশন হিসাবে বিনা পয়সায় চিঁড়ে গুড় পেত। এই রেশন বিতরণ করতো বেসরকারি ত্রাণ সংস্থার কর্মীরা। এখানেই সরকার ও সংস্থার কর্মীদের দায়িত্ব শেষ। কারুর অসুখ করলে তাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না, প্রসব যন্ত্রণায় কাতর কোনো মহিলারও কোনো সাহায্যের আশা ছিল না। আমি যখন সাউথ স্টেশনে গেলাম তখন দেখলাম একজন কঙ্কালসার উলঙ্গ মানুষ হাজার হাজার নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের সিঁড়িতে মলত্যাগ করছে।

পুনর্জন্মের প্রতীক্ষায় শিয়ালদহ স্টেশনে

সূত্র: https://www.anandabazar.com/events/independence-day/was-the-day-of-freedom-completely-independent-dgtl-1.456368

এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতেও ত্রাণকর্মী সেজে কিছু মানুষ উদ্বাস্তুদের প্রতারণা করছিল। তারা উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্বাস দিত তারা সাপ্তাহিক অর্থ ও চিঁড়ে গুড়ের সরকারী বরাদ্দ (ডোল) পাইয়ে দেবে। পরিবর্তে অর্থ ও ডোলের কিছুটা তাদের দিতে হবে। এছাড়া এরা যুবতী নারীদের দেহ ব্যবসার অন্ধকার জীবনে নিয়ে যেত।

ভাবতে পারেন, কীভাবে এই হতভাগ্য মানুষেরা দিনের পর দিন রাতের পর রাত প্লাটফর্মে দিন কাটাচ্ছে? কল্পনা করুন যুবতী মেয়েরা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খোলা জায়গায় স্নান করছে। হাজার হাজার মানুষের ব্যবহার করা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পায়খানা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে খোলা জায়গায় মানুষ ঘুমোচ্ছে। তিনটি ইট দিয়ে উনুন তৈরি করে আবর্জনা জ্বালিয়ে রান্না করা খাবার খাচ্ছে।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮-ই অক্টোবর ১৯৪৮)

নারীর আব্রুতার বিষয়টি ঠিক কোন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল এই বিবরণ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সময় বহু নারী তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। কারো পরিবারের পুরুষ সদস্য দাঙ্গায় নিহত হন এবং আত্মীয়ের বাড়িতে নারীটির স্থান সংকুলান হয়নি, আবার কোনো নারী নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক হলেও ধর্ষিতা হওয়ার অপরাধে কিংবা সন্দেহে পরিবার থেকে বিতারিত হন, দালালের খপ্পরে পরে বহু নারী দেহ ব্যবসার অন্ধকার গলিতে হারিয়ে যান চিরতরে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় স্বাধীনতার পর দিল্লি বোম্বের গণিকালয়গুলি উদ্বাস্তু মেয়েদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[১০] স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরেও এই দালাল চক্র কতটা সক্রিয় ছিল তা ১৯৮৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার বিবরণ থেকে বোঝা যায়। এখানে একটি উদ্বাস্তু মেয়ে কীভাবে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে, পরে পুলিশ তাকে Homeless Act-এ গ্রেফতার করে সরকারী হোমে পাঠালেও কিছু অসৎ ব্যক্তি ভুয়ো আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে তাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে পতিতালয়ে পাঠায় সে ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে।

রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে শরণার্থী শিবির

সূত্র: https://www.anandabazar.com/events/independence-day/was-the-day-of-freedom-completely-independent-dgtl-1.456368

এই সময় ভারত সরকারের তরফে একাধিক উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়েছিল। এই শিবিরগুলি আবার তিনভাগে বিভক্ত ছিল, - ১. ট্রানজিট ক্যাম্প, ২. মহিলা আশ্রয়কেন্দ্র, ৩. স্থায়ী দায় আশ্রয় কেন্দ্র।[১১] প্রথম প্রকার ক্যাম্পে সেই সকল উদ্বাস্তুদের সরকারের পক্ষ থেকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত যারা অন্যত্র স্থানান্তরযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেরকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করার প্রচেষ্টা সরকারের তরফে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দুটি উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবির ধুবুলিয়া রিফিউজি ক্যাম্প এবং রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প ছিল প্রথম উল্লেখিত শিবিরগুলির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ধরনের আশ্রয় কেন্দ্রে থাকতো বিধবা, পঙ্গু ও অসহায় মহিলারা। তৃতীয় প্রকার আশ্রয় কেন্দ্রে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, নাবালক এবং অভিভাবকহীন মহিলারা থাকতেন। নাম থেকেই স্পষ্ট এরা ছিলেন সরকারের কাছে বোঝা স্বরূপ এবং পুরোপুরি সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণত পরিত্যক্ত সেনা ছাউনি, পাটের গুদাম, অব্যবহৃত বিমান অবতরণ ক্ষেত্র (ধুবুলিয়া) প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের আশ্রয় শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে কম বেশি সব ক্যাম্পের অবস্থায় ছিল প্রায় একইরকম। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প ছিল সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যক উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল। পরিত্যক্ত সেনা শিবিরের গুদামঘরগুলি এই সময় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাধারণভাবে 'নিসেন হাট' নামে পরিচিত ছিল। গুদামঘরগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত বাড়তি উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিতে সামরিক তাঁবুগুলিকেও কাজে লাগানো হয়েছিল।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক ঠিক কীরকম ছিল উদ্বাস্তু শিবিরে মানুষগুলোর জীবন, সর্বোপরি নারীদের অবস্থা। সাধারণভাবে গুদাম ঘরগুলির আয়তন ছিল ১০০' × ২৫'। এক একটি ঘরে কুড়িটি করে পরিবারকে রাখা হয়েছিল দুটি সারি করে। একটি পরিবারের থেকে অন্য পরিবারের জন্য নির্ধারিত জায়গাটি দড়ি বা নুড়ি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হত। এমন পরিস্থিতিতে কোনো পরিবারের পক্ষে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তবে পরনের কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে খানিকটা আড়াল সৃষ্টি করে আব্রু রক্ষার একপ্রকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নারীরা করে থাকতেন। একটি সূত্র থেকে জানা যায় কুপার্স ক্যাম্পের উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর হাজার আর এদের ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী পায়খানা ছিল মাত্র আশিটি এবং জলের কল ছিল মাত্র কুড়িটি।[১২] সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া রান্না করা খাবার কিংবা ক্যাশ ও ড্রাই ডোলের ওপর নির্ভর করে এদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। এই উদ্বাস্তুদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে সরকার দোলাচলে থাকায় ক্যাম্পের বাইরে বা ভিতরে কোনো উপার্জনক্ষম কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি এই উদ্বাস্তুদের দেওয়া হয়নি বরং এমন কিছু অপরাধে দোষী হলে সরকারী সাহায্য ডোল বন্ধ করে দেওয়া হত। ক্যাম্পে মানুষের সংখ্যার তুলনায় ক্ষুদ্র পরিসরে বসবাস শুধু নয় সেখানেই রান্নাসহ ঘরকন্যার কাজ, সন্তান জন্ম দেওয়া, মৃত্যু ও মৃতদেহ ফেলে রাখা সবই হত। অনুপযুক্ত বসবাসের পরিবেশ, খাদ্য ও চিকিৎসার অভাব প্রভৃতির কারণে মৃত্যু এই উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। সরকারের পক্ষ থেকে একটা মৃতদেহের সৎকারাদি কাজ বাবদ ১৬ টাকা করে ধার্য করা থাকলেও অধিক মুনাফার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি একসাথে একাধিক মৃতদেহ দাহ বা অর্ধদাহ করে ফেলে দেওয়াকেই অধিক শ্রেয় বলে মনে করতেন। কাজেই উদ্বাস্তু শিবিরে সপ্তাহে একদিন মড়া নিতে ট্রাক আসতো এবং সব মড়া বোঝায় করে নিয়ে যেত। কিন্তু এই এক সপ্তাহের মধ্যে যতজন মারা যেত তাদের সবাইকে ওই বসবাসরত গুদাম ঘরের এক পাশে স্তূপাকারে ফেলে রাখা হত। সপ্তাহ শুরু থেকে শেষের দিকে যত এগোতো এই মৃতের স্তূপের আকার যে ক্রমশ বৃদ্ধি পেত আর তার সাথে দুর্গন্ধ বিকট আকৃতি ধারণ করত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পুষ্টিকর ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এই সময়ে শিশু মৃত্যুর হারও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ধুবুলিয়া ক্যাম্পের একজন উদ্বাস্তু মহিলার বক্তব্য স্মরণ করা যায়, যিনি বলেছেন, -

> "বড় দুঃখের দিন গেছে। শত শত শিশু আমাশয়ে মারা গেছে ...গোটা ক্যাম্পে সন্তানহারা নারীর আর্তনাদ। সে সময় থাকলে দেখতে পেতেন রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে শিশু কোলে নিয়ে মেয়েরা কাঁদছে, অপেক্ষা করছে কখন ট্রাক আসবে, মৃত শিশুদের সৎকার করতে নিয়ে যাবে।"[১৩]

সাধারণত একেবারে ছোটো শিশু মৃতদেহগুলি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত, তবে অনেক সময় এগুলোকে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত পশু খাদ্য হবে বলে। অমানুষিক এই পরিস্থিতি সকল উদ্বাস্তুর জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেও মায়ের জাতি মেয়েদের জন্য এর মাত্রাটা আরো বেশি। কারণ, -

প্রথমত, একজন গর্ভবতী নারী যার সন্তান হয়তো ভবিষ্যতে ভারতের একজন নাগরিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু ক্যাম্পের এমন দুঃসহ পরিস্থিতি সেই নারী এবং তার ভিতরে বেড়ে ওঠা সন্তানের যে মানসিক ক্ষতি করেছে আগামী দিনে তার প্রভাব অবশ্যই শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবন এবং পরোক্ষে দেশের ওপর পরেছে।

দ্বিতীয়ত, অতি প্রয়োজনীয় ব্যাক্তিগত গোপনীয়তা এবং নূন্যতম স্বাস্থ্য পরিষেবার একান্ত অভাবের মধ্যে সন্তান জন্ম দেওয়া একজন প্রসূতি মায়ের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর কীরকম বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হানাহানি থেকে উদ্ভূত দেশভাগের পরিস্থিতি এবং এ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প সরকারী সহযোগিতা ও এর সাথে যুক্ত হওয়া দুর্নীতি, অপুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ এবং এর ফলে অপুষ্টি, আমাশয় ইত্যাদিতে বহু শিশুর প্রাণ অকালে ঝরে যায়। মা হিসাবে একজন নারীর কাছে এর চেয়ে পীড়াদায়ক হয়তো আর কিছু হয় না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভবরকম দুর্দশার মধ্যে অলসভাবে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তু মানুষগুলি একপ্রকার বন্য জন্তুতে পরিণত হয়েছিল বলা যায়। যেখানে গোপনীয়তার ব্যবস্থা তো দূরের কথা মানুষের একদম প্রাথমিক জৈবিক চাহিদা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, মল মূত্র ত্যাগের যথাপোযুক্ত ব্যবস্থার অপ্রতুলতা তেমন পরিস্থিতিতে নারীর আব্রু ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এই সময় একদিকে এদেশীয় মানুষদের অবজ্ঞার দৃষ্টি, সরকারের অপর্যাপ্ত সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব, ক্যাম্পের বাসস্থানের দুরবস্থা, ক্যাম্পবাসীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সর্বোপরি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর মধ্যে থেকে মানবিক মূল্যবোধ একপ্রকার লোপ পেতে থাকে। উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে অবৈধ জৌন সম্পর্ক, অদ্ভূত বিবাহ, পতিতাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে একজন ক্যাম্পবাসীর বক্তব্য উল্লেখ করা যায় যেখানে তিনি জানিয়েছেন, -

> "আমরা আর মানুষ ছিলাম না। আমাদের আচরণ পশুর মতো হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই এইরকম ঘটনা ঘটত। আমরা জানতেও পারতাম না কার মশারির ভেতর কে শুচ্ছে।"[১৪]

'সতীত্ব' বিষয়টি নারী এবং সমাজের চাহিদার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু অভাব নারীর সতীত্বের ওপর করাল থাবা বসায়। নারী স্বেচ্ছায় দেহ ব্যবসায় নিমজ্জিত হয়েছে এমন অনেক বিবরণও একাধিক সূত্র থেকে পাওয়া যায়। কখনো একজন নারী এক মুঠো কয়লা বা কিছু পয়সা বা একটা কাপড়ের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করতো এমন উদাহরণও বিরল নয়।[১৫]

উদ্বাস্তু শিবিরের পাশবিক জীবনযাপনে উদ্বাস্তরা একসময় হাঁপিয়ে ওঠেন। সেখানে হওয়া দুর্নীতি, সরকারের খেয়ালখুশি মতো যত্রতত্রস্থানে উদ্বাস্তুদেরকে পুনর্বাসনের নামে প্রেরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও প্রচ্ছন্নভাবে এতে মদত দিতে থাকে। এই সূত্রধরেই গড়ে উঠতে থাকে একাধিক জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনি।[১৬] এই ধরনের আন্দোলনে কেবলমাত্র উদ্বাস্তু পুরুষরাই নয়, উদ্বাস্তু নারীরাও শামিল হন। পরিবারের শান্ত গৃহকোণে আবদ্ধ অবলা নারীরা এই সময় যথার্থ সহযোদ্ধার মতো পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ান। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দেওয়া বর্ণনাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, যেখানে তিনি লিখেছেন, - "The women volunteers stood in the van against the assault of the police. Behind then stood the male volunteers, and the children brought up the rear." এই সময় নারীরা ঝাঁটা, খুন্তি ইত্যাদি নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন। এমনকি শঙ্খকে তারা কেবল পূজার ঘরে নয়, সচেতনতা প্রেরণের বার্তাবহ যন্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। অনুরুপ বর্ণনা সাবিত্রী রায় রচিত 'স্বরলিপি' উপন্যাসেও রয়েছে, যেখানে লেখিকা লিখেছেন, -

> "যেই কলোনি আক্রমণ করে ভাড়াটে গুন্ডারা অমনি বিপদের সংকেত হিসাবে মেয়েদের শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে, এক একটা কলোনি যেন সংগ্রামের দুর্গ হয়ে উঠেছিল। পুলিশ বা গুন্ডা বাহিনীরা কলোনি উচ্ছেদ করতে এলে পুরুষেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেও কলোনির মেয়েরা দলবদ্ধভাবে সতর্ক পাহারায় থাকতো।"[১৭]

উদ্বাস্তু আন্দোলনের সূত্রে সাধারণ পরিবারের নারীরাও রাজনীতির অনেকটা কাছাকাছি চলে আসেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনের সপক্ষে হওয়া সভা-সমিতি, মিছিলে নারীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৪ সালে বান্ধবগড় কলোনিতে মহিলা সমিতির সভায় প্রায় ২০০ নারীর অংশগ্রহণ, ১৯৫৪ সালের ১০ই আগস্ট কাশিপুরে উদ্বাস্তু ট্রানজিট ক্যাম্পে বৃদ্ধা ননীবালা ভট্টাচার্য্যের ১১ দিন যাবৎ বিভিন্ন অভাব অভিযোগের প্রতিকারের দাবিতে অনশন, ১৯৫৬ সালের ৬ই জুলাই হুগলি জেলার ভদ্রকালী উদ্বাস্তু শিবিরের মহিলাদের দ্বারা কলকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ার থেকে লরেন্স রোড পর্যন্ত সংঘটিত মিছিল, ১৯৬১ সালের ২৪শে নভেম্বর দুর্গাপুর বিডিও অফিসের সামনে মহিলা নেত্রীর নেতৃত্বে হওয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি, একই সালের ১৩ ডিসেম্বর বর্ধমানের কাকসা ক্যাম্পে সরকারের কলোনি উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে হওয়া সভায় মহিলা নেত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও নারীদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। একসময়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শান্ত গৃহকোণে আবদ্ধ নারীরা উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে গিয়ে ধীরে ধীরে যে নিজেদের দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন এই ঘটনাগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সূত্রঃ https://www.itihasadda.in/movement-of-bengali-ladies/

জবরদখল কলোনি স্থাপন কিংবা সরকারের তরফে পুনর্বাসন যেভাবেই হোক না কেন উদ্বাস্তুরা মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই অবশেষে যোগাড় করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এদেশে এসে হঠাৎ কোনো কাজ জোগাড় করে পরিবারের যথাযথ ভরণ পোষণ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের ছিল না। কাজেই পারিবারিক প্রয়োজনে বরং বলা ভালো পেটের দায়েই নারীকে বাইরের পেশা জগতে পা বাড়াতে হয়। আগে যা ছিল নিতান্ত স্বল্প কিছু নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, উদ্বাস্তু নারীরা তাতে অংশ নিয়ে বহির্জগতে কর্মরত নারীর সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়ে দেন। এই সময়টাতে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা তুলনায় ছিল কম। উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে সংখ্যাটা ছিল প্রায় হাতেগোনা। যদিও এনাদের মধ্যে অনেকেই বর্ধিষ্ণু পরিবারে অন্তঃপুরে পর্দাসীনভাবে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। অভাব কোনো নিয়ম মানে না, কাজেই অন্তঃপুর থেকে এই কুলবধূদেরকে একেবারে বাইরের জগতে টেনে বের করে আনে। এনাদের মধ্যে যারা খানিকটা শিক্ষিত ছিলেন তারা শিক্ষকতা, অফিস দপ্তরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, সেলস গার্ল ইত্যাদি কর্মে নিযুক্ত হন। কর্মপ্রাপ্তির আশায় এই সময়ে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরীক্ষাগুলিতে এর প্রভাব পড়ে। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালে অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বোস মন্তব্য করেন, -

> “It is one of the signs of the times that womens education advanced at a faster rate than men's.”[১৮]

তবে শিক্ষিত হবার মতো সামর্থ্য সকলের ছিল না, কিন্তু আর্থিক উপার্জনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল। এই কারণে বহু নারী অন্যের বাড়িতে বাসন মাজা, অফিস পাড়ায় টিফিন ও তেলেভাজার দোকান, সেলাই ও তাঁতের কাজ প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত হন। এমনকি কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সুযোগ পেয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নারীদেরকে চালের চোরা কারবারের সাথে যুক্ত করেন।[১৯] এই সময় অনেক মহিলা জঙ্গল, পোড়ো জমি প্রভৃতি স্থান থেকে কচুর ডাটা, মান কচু, শাক-পাতা তুলে এনে সেগুলি বাজারে বিক্রি করার জন্য চেষ্টা চালান। এতদিন সভ্য সমাজের মানুষের কাছে এগুলি বাজার থেকে কিনে খাওয়ার মতো সু-খাদ্য বলে বিবেচিত ছিল না। এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু নারীদের হাত ধরে খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আসে। অভিনয় জগতে নারীর পদচারণা খুব একটা কাম্য ও অতিরিক্ত সম্মানজনক পেশা বলে মোটেও গণ্য হতো না। কিন্তু দেশভাগ অভিনয় জগতেও পরিবর্তন আনে। এই সময় বহুনারী আর্থিক প্রয়োজনে অভিনয়কে পেশা হিসাবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বেছে নেন। অভিনয় জগতে 'অভিনেত্রী' পদটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রুপ থিয়েটারের সাথে যুক্ত দিপালী চক্রবর্তী, অভিনয় জগতে আসা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০]

যদিও নারীর উপার্জনকে অধিকাংশ পরিবারে প্রধান নয়, বাড়তি আর্থিক আগমনের উৎস হিসেবেই দেখা হত। কিন্তু এই সূত্রে নারীদের মধ্যে বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতনতা, শিক্ষিত হয়ে ওঠার যে প্রবণতা দেখা যায় তা নারী সমাজের জন্য সদর্থক বার্তা বহন করে আনে। আর এতে অগ্রণী পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হওয়া নারীরা। এই প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেনের বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁর ভাষায়, -

> "পূর্ব বাংলায় থেকে গেলে হয়তো মেয়েদের এই পরিবর্তনটা আসতো না। দেশান্তরী নারী সময়ের দাবিকে সামনে রেখে দ্রুত নিজের বদল ঘটিয়েছে, পাশাপাশি বদলে দিয়েছে তার চারপাশের সমাজকে। জীবন সংগ্রামে উদ্বাস্তু মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল, তাতে কেবল ঐ ছিন্নমূল মানুষরা পায়ের তলার মাটি খুঁজে পায়নি, সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের নারী মুক্তির পথ উন্মোচিত করেছিল।"[২১]

এতদিন পরিবারে যেকোনো সিদ্ধান্তে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, কিন্তু এই সময় থেকে ধীরে ধীরে উপার্জনকারী নারীর মতামতটিও পুরুষ সদস্যের মতামতের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নারীদের মধ্যে সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে একাধিক নারী সংঘ। এই নারী সংঘগুলি নারী-পুরুষ বৈষম্যজনিত অবিচার, পণ-মৃত্যু, ধর্ষণ, মদ্যপানজনিত গার্হস্থ্য হিংসা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এসবের ফলে সত্তরের দশক থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশক ধরে নারীর স্বার্থে স্থানীয় ও ব্যাপক মাত্রায় নানারূপ আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে।[২২] ফলস্বরূপ নারী-পুরুষ বৈষম্যের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন শতাব্দী নারীদের জন্য নিয়ে আসে সমাজের রক্ষণশীলতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে ঘরের বাইরে মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার সৌভাগ্য, সকলের কানে কানে শুনিয়ে যায়, - নারীরাও পারে পুরুষের সমকক্ষ এমনকি তার থেকে উচ্চ ক্ষমতায় আরোহণ করতে। এরই প্রস্তুতি স্বরূপ নতুন শতাব্দি আগমনের প্রাক্-মুহূর্ত থেকেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান সর্বত্র ধ্বনিত হতে শোনা যায় নারীদের জয়জয়কার। যদিও নির্ভয়া কান্ড কিংবা আর.জি.কর-এর মহিলা ডাক্তারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মতো কিছু ঘটনা এখনো ভাবতে আমাদেরকে বাধ্য করে স্বাধীন দেশে নারী কী সত্যিই স্বাধীন? তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই আজ থেকে ৬০-৭০ বছর পূর্বের নারী আর বর্তমানের নারীর মধ্যে অনেক তফাৎ, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সেই সময়ের অধিকাংশ নারী ছিলেন সহধর্মিণীর মতো কিন্তু যথাযথ অর্ধাঙ্গিনীর ভূমিকা পালন করতে পারতেন না, রক্ষণশীল সমাজ তাদেরকে সেপথ থেকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে 'সতী', 'লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রী', 'সুমাতা' প্রভৃতি খেতাব দিয়ে ভুলিয়ে রাখতো। অন্যদিকে বর্তমানে নারী কেবলমাত্র সহধর্মিণী ও অর্ধাঙ্গিনী নয়, তারা পুরুষদের যথাযথ সহযোদ্ধা, সামান্য কিছু রক্ষণশীল ব্যতিক্রম পরিবার বাদ দিলে ঘরে ও বাইরে সর্বত্র নারীদের অবাধ বিচরণ। এই মুক্তির স্বাদ আমরা যারা একবিংশ শতাব্দীতে গ্রহণ করতে পারছি তারা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞ সেদিনের সেই সকল উদ্বাস্তু নারীদের প্রতি যারা সেদিন সমাজের রক্ষণশীলতার ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে সাংসারিক প্রয়োজনে বাইরে উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাদের পা সেদিন কন্টকবিদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই পদযুগলের পবিত্র রক্তে তাঁরা সেদিন যে নারী মুক্তির দেবীকে আহ্বান করে এনেছিলেন সেই আশীর্বাদের সুফল আমরা একবিংশ শতকের নারীরা ভোগ করছি। আজ যে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা এত সচেতন তার সর্বাগ্র যোদ্ধা ছিলেন সেদিনের সেই তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রিহীন, দরিদ্র, অত্যাচারিতা উদ্বাস্তু নারী, যারা নিজেদেরকে পুড়িয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য বয়ে এনেছেন নারী মুক্তির বার্তা। এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির মূলে রয়েছে যে দেশভাগ ও তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সেই দেশভাগকে কি আমরা অভিশাপ বলতে পারি? এখানে এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় 'দেশভাগ' কখনোই সদর্থক নয়। আমরা ভুলে যেতে পারি না এই দেশভাগ কত মানুষের জীবন, নারীর সম্মান, সুখের নীড় কেড়ে নিয়েছে, জন্ম দিয়েছে ঐতিহ্যমন্ডিত দেশ ভারতবর্ষের স্বর্ণ অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন দেশের, ব্যবচ্ছেদ করে দিয়েছে বীর বিপ্লবী ও সমাজ সংস্কারকদের কীর্তির সূচনাভূমি বাংলাকে। তাহলে দেশভাগের হাত ধরে যে উদ্বাস্তু সমস্যার জন্ম হলো আর যে উদ্বাস্তু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 133 - 143
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমস্যা সমাজের রক্ষণশীলতাকে আলগা করে নারীমুক্তির বাতাস বইয়ে দিল আমরা কি দেশভাগের সেই সদর্থক দিকটিকে অস্বীকার করবো? এক্ষেত্রে বলা যায় ইতিহাস কোনো কালে কখনোই থেমে থাকেনি। স্বাধীনতার পূর্বেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ ও সমাজ সংস্কারকদের হাত ধরে নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতার যে বীজ রোপিত হয়ে গিয়েছিল তা একদিন না একদিন অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে মহীরুহে পরিণত হওয়া ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা, দেশভাগ সেই বিষয়টাকেই ত্বরান্বিত করেছিল।

Reference:

১. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, পৃ. ১৬ - ১৭
২. বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, (১৯৬০), *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৫৬ - ৫৭
৩. মণ্ডল, পলাশ, (২০২১), *অধিকার অর্জনে উদ্বাস্তু বাঙালী নারীর প্রতিরোধ আন্দোলন: প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ (১৯৪৭ - ১৯৭৭)*, ইতিহাস তথ্য ও তর্ক, ইউ.আর.এল: itihasadda.in/movement-of-bengali-ladies, প্রবেশ করা হয়েছে ১৪.০১.২০২৬ তারিখে।
8. Weber, Rachel, (2007). Re(creating) The Home: Women's role in the development of Refugee Colonies in South Calcutta, *Indian Journal of Gender Studies (Centre for Women Developments Studies)*, Vol. 02, No. 02, pp. 195 - 210
৫. বাগচী, যশোধরা, (২০১২), *নারী ও নারীর সমস্যা*, অনুষ্টুপ, পৃ. ১০৫ - ১০৭
৬. কুন্ডু, ত্রিদিব সন্তপা, (২০১৩), বার্ধক্যে বাস্তুচ্যুতি-বাংলার দেশভাগজনিত দুর্ভোগের একটি দিক, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, খন্ড-১৯, পৃ. ৫৯৪
৭. www.bengalfilmarchive.com<article-details.php?I=NA== Accessed 5th February 2026.
৮. বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপ, (২০০১), *দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ৪০
৯. সেনগুপ্ত, নিলেন্দু, (২০১২), *বিধানচন্দ্র ও সমকাল*, একুশ শতক, পৃ. ১২৫
১০. বসু, জয়ন্তী, (২০১৩), (সম্পা.), *রিকন্সট্রাকটিং দ্য বেঙ্গল পার্টিশন*, সাম্য প্রকাশন, পৃ. ১০১
১১. Chaudhuri Basu, Anusua, Dey, Ishita, (2009). Citizens, Non-citizens and in the Camps Lives, Mahanirban Calcutta Research Group, p-177
১২. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
১৩. *তদেব*, পৃ. ৮৩ - ৮৪
১৪. *তদেব*, পৃ. ৮২
১৫. চক্রবর্তী, সৌমেন, (২০১২), *বহুস্বরে উদ্বাস্তুসত্তায় বাঙালি*, মুক্তমন, পৃ. ৩৯
১৬. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
১৭. রায়, সুমন, (২০২১), দেশবিভাগ ও নারী সমাজ: প্রসঙ্গ বাঙালি উদ্বাস্তু নারী, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, খন্ড ২৩, পৃ. ৭৬৭ - ৭০
১৮. শিকদার, অশ্রুকুমার, (২০০৫), *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, পৃ. ১১
১৯. দাশগুপ্ত, রাণী, (১৯৯৮), *দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মেয়েরা, চলার পথে*, স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি সংখ্যা, পৃ. ৪৫
২০. বন্দোপাধ্যায় (রায়), চিত্রিতা, (২০০০), *সময়ের উপকরণ: মেয়েদের স্মৃতিকথা*, পুস্তক বিপনি, পৃ. ১২৯
২১. মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব কুমার, (২০২১), *প্রসঙ্গ-দেশভাগ*, বিতর্কিকা, পৃ. ৪৮ - ৫০
২২. চন্দ্র, বিপন, মুখার্জি, মৃদুলা, মুখার্জি, আদিত্য, (২০২৩), লাহিড়ী, আশীষ, (অনু.), *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ - ২০০০*, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৪১